Irving House Script Has Been Translated Into বাংলা (Bengali) By Nabila Huq

আর্ভিং নিবাস পরিভ্রমণ নির্দেশিকা বঙ্গানুবাদ করেছেন নাবিলা হক

আর্ভিং নিবাস পরিভ্রমণ

আর্ভিং নিবাসে স্বাগতম। এই বাড়িটি লোয়ার মেইনল্যান্ডের আজ অবধি টিকে থাকা সবচেয়ে পুরনো বাড়ি!

আর্ভিং নিবাস ১৮৬৫ সালে নির্মিত হয় আর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আর্ভিং পরিবার এ বাড়িতে অবস্থান করেন। এ বাড়িটি নির্মাণে ১০,০০০ ডলার খরচ পড়েছিল যা ছিল তৎকালীন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির বার্ষিক আয়ের সমান। এই বাড়ির জমি উইলিয়াম আর্ভিং জনৈক ক্লার্কসনের নিকট থেকে ৪,০০০ ডলারে ক্রয় করে নিয়ে ছিলেন। এর আগে পর্যন্ত আর্ভিং পরিবার ভিক্টোরিয়ায় বসবাস করতেন।[1] ঔপনিবেশিক এ বাড়িটি গথিক-পুনর্জাগরণ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয়েছে।

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম আর্ভিং ১৮১৬ সালে স্কটল্যান্ডের আনান, ডামফ্রিশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। উইলিয়াম ১৫ বছর বয়সে একজন কেবিন বালক হিসেবে প্রথমবার সমুদ্রযাত্রায়ে যান। ১৯ বছর বয়সেই তিনি ফার্স্ট মেট (first mate) পদে উন্নীত হন। দশ বছর পর তিনি তাঁর নিজের জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে সক্ষম হন, আর ১৮৪৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশ্য পাড়ি জমান।

ক্রমে ক্রমে ক্যাপ্টেন আর্ভিং পোর্টল্যান্ড, অরেগন পর্যন্ত পৌছান। আর সেখানেই তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ জেন ডিক্সনের সাক্ষাৎ হয়। ১৮৫১ সালে তাঁদের বিয়ের সময়ে ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের ৩৮ আর এলিজাবেথের ১৮ বছর বয়স ছিল। এই দম্পতির প্রথম চার সন্তান মেরি (২৫ ডিসেম্বর ১৮৫২), জন (২৪ নভেম্বর ১৮৫৪), সুজান (১০ মার্চ ১৮৫৭), এলিজাবেথ (২৯ ডিসেম্বর ১৮৫৯) অরেগনেই জন্মলাভ করেন । ১৮৫৯ সালে তাঁরা ভিক্টোরিয়ায় চলে আসেন; এখানেই তাঁদের পঞ্চম সন্তান নেলির (১২ নভেম্বর ১৮৬৩) জন্ম হয়।[2] পরিবারটি ক্যারিবু স্বর্ণতৃষার (gold rush) সময়ে ভিক্টোরিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হন যখন ক্যাপ্টেন আর্ভিং নিউ ওয়েস্টমিনস্টার থেকে ইয়েল পর্যন্ত নদীপথে নৌচালনায় সংযুক্ত হয়ে পড়েন। ক্যাপ্টেন আর্ভিং ফ্রেজার নদীর উজান পথে স্বর্ণখনিজীবীদের জন্য অত্যন্ত সাবধানতা ও দক্ষতার সাথে চক্রদাঁড় (paddle wheel) চালনা করেন এবং বিনিময়ে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন।

আর্ভিং নিবাস কাহিনী

১৮৬২ সালে ক্যাপ্টেন আর্ভিং রিলায়েন্স নামে একটি sternwheeler উদ্বোধন করেন। রিলায়েন্স ভিক্টোরিয়া থেকে যাত্রা আরম্ভ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেন আর্ভিং সন্তানদের শাসনে একটু শিথিল ছিলেন। খুব সম্ভব, আট বছর বয়সী জন শ্যাম্পেন পানের হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠেছিলো। ফলে, জন মাতাল হয়ে পড়ে আর তার পিতার একজন কর্মচারীকে তাকে বাসায় নিয়ে আসতে হয়। জনের এহেন অবস্থা দেখে তার মা এলিজাবেথ চিকিৎসককে তলব করেন।কিন্তু চিকিৎসক জনের নেশার বেপারটি তার মায়ের কাছ থেকে গোপন রাখেন আর জনের শরীর খারাপ করার জন্য অন্য এক কারণ বানিয়ে বলেন।[3]

[1] আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা

[2] সকল তারিখ আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা থেকে সংগৃহিত

[3] আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা

ফুসফুসের দু'পাশেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৭২ সালে ৫৬ বছর বয়সে ক্যাপ্টেন আর্ভিং মৃত্যুবরণ করেন। ৩০ আগস্ট এই আর্ভিং নিবাসেই তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর বিধবা স্ত্রী এলিজাবেথ ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে আরো ১৩ বছর এ বাড়িতেই রয়ে যান। এরপর ১৮৮৫ সালে এলিজাবেথ পোর্টল্যান্ড, অরেগনেই ফিরে যান। বাপের বাড়ির দেশকেই তিনি সবসময় তার নিজের দেশ বলে মনে করতেন।

১৮৭২ সালে ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের একমাত্র পুত্রসন্তান জন ১৭ বছর বয়সে তাঁর পিতার ব্যবসায়ের হাল ধরেন। জন আর্ভিং ১৮৮৩ সালের ১২ জুন জেন মানরোকে বিয়ে করেন।[4] তাঁদের তিনটি সন্তান হয় যাদের একজন উইলিয়াম এলেকজান্ডার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৮১৬ সালে আলবার্ট, সমে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে আর্ভিং পরিবারের পৈত্রিক ধারারও অবসান ঘটে।

মেরি আর্ভিং ১৮৭৪ সালে টমাস ল্যাশার ব্রিগসকে বিয়ে করেন। ১৮৮৪ সালের ৩ অক্টোবর তিনি তাঁর ভাই জনের তত্বাবধানে এক নিলামে আর্ভিং নিবাস কিনে নেন।[5] সম্পত্তি আইনের পরিভাষায় কোবালা প্রক্রিয়ায় বাড়ির মালিকানা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়।[6] ব্রিগস দম্পতি তাঁদের নয়জন সন্তানকে এ বাড়িতেই লালন–পালন করেন। তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ দুই কন্যা, নাওমি এবং ম্যানুয়েলা, আজীবন অবিবাহিতই থেকে যান। ১৯৫০ সালে পৌরের (City) কাছে এ বাড়িটি জাদুঘর হিসাবে বিক্রি করে দেবার আগ পর্যন্ত তাঁরা এখানেই বসবাস করেন।

<u>নিউ ওয়েস্টমিনস্টারের গল্প</u>

১৮৫৭ সনে ইয়েলে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়ার পর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাগ্যান্বেষীরা ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় ছুটে আসেন। কিন্তু সে সময়ে উত্তর আমেরিকায় পশ্চিম উপকূলে প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ উপনিবেশ বলতে ছিল একমাত্র ভিক্টোরিয়া - মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ। মূল ভূখণ্ডে কোন উপনিবেশের অনুপস্থিতি এখানে ব্রিটিশদের সামরিক শক্তি আর ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিকেই নির্দেশ করে। এর ফলে আমেরিকা যেকোন সময়ে এই ভূখণ্ডকে নিজেদের সাথে জুড়ে নিতে পারে বলে ব্রিটিশদের মাঝে গভীর উদ্বেগ দেখা দেয়। এই দুশ্চিন্তার সমাধান করতেই ব্রিটিশরা মূল ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় যাতে করে এই অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চাভিলাষ - এই দুইয়েরই বহিপ্রকাশ ঘটে। ডার্বিতে (আজকের পোর্ট মুডি) পৌর স্থাপনার মূল পরিকলনা ছিল। কিন্তু যখন কর্নেল রিচার্ড ক্লেমেন্ট মুডি নৌপথে এই এলাকায় প্রবেশ করেন, তখন ঘন জঙ্গল বিশিষ্ট অত্যন্ত খাড়া ঢালু ভূমিরূপ প্রত্যক্ষ করেন। সেই মুহূর্তেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ডার্বির পরিবর্তে এখানেই উপনিবেশের স্থাপনা হবে। যদি কখনো আমেরিকার তরফ থেকে কোন আক্রমণের আশংকা থেকেও থাকে, তবে খাড়া ঢাল বিশিষ্ট ভূমিরূপ প্রতিরক্ষায় কার্যকরী কৌশলগত অবদান রাখবে। কর্নেল মুডির নির্দেশেই ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজপ্রকৌশল বিভাগ গঠিত হয়। এই বিভাগের

[4] আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা
[5] আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা

[6] http://thelawdictionary.org/conveyancing/

প্রধান দায়িত্বসমূহের মধ্যে ছিল - নিউ ওয়েস্টমিনস্টার শহর নির্মাণ, সম্ভাব্য অন্যান্য শহর স্থাপনার ভূমি জরিপ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তত্ত্বাবধায়ন, এবং স্বর্ণখনির উপর নজরদারি। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার প্রকৌশল বিভাগ নদীর আরো উজানে অবস্থিত একটি ছাউনি থেকে এই নতুন নগর প্রতিষ্ঠার সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। আজকের স্যাপারটন এলাকার নামকরণের পিছনের কারণই হলো এই এলাকায় সেই ছাউনির অবস্থান। মধ্যযুগে ব্রিটিশ সামরিক প্রকৌশলীদের স্যাপার বলা হতো কারণ তাদের কাজই ছিল দুর্ভেদ্য দূর্গের প্রাচীর থেকে সব শক্তি নিংড়ে (sap) নেওয়া। প্রাচীরের দেয়ালের নীচে প্রকৌশলীদের খননকৃত সুড়ঙ্গে শূকরের চর্বি গলিয়ে কখনো কখনো তাঁরা এই কাজ সম্পাদন করতেন।

ছোট বৈঠকঘর

বাড়িতে ঢুকতেই আপনার হাতের ডানদিকে পড়বে ছোট বৈঠকঘর। আপনি প্রথমেই লক্ষ্য করবেন, ঘরটি বেশ বিলাসবহুল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিক আতিথেয়তায় ব্যবহৃত হত এ ঘরটি। পারিবারিক ছবি আর পরিবারের সবচেয়ে দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হত ঘরটিকে। খুব সম্ভবত, বাচ্চাদের এ ঘরে ঢুকতে বারণ ছিল আর বেশিরভাগ সময়েই ঘরটি বন্ধ থাকত।

ফায়ারপ্লেসের (আবরণ কৃত্রিম মর্মরের কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্লেটের তৈরী) উপরে রাখা ছবিটি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম আর্ভিঙের। তার বাঁদিকের ছবিটি ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের মেয়ে মেরি ব্রিগসের বিয়ের ছবি। ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের ডানদিকের ছবিতে টমাস ল্যাশার ব্রিগস। ফায়ারপ্লেসের ডানদিকের দেয়ালে ঝুলছে ক্যাপ্টেন এবং বেগম আর্ভিঙের বিয়ের ছবি, তাঁদের ছেলে জন আর্ভিঙের ছবি, আর বেগম আর্ভিঙের সাথে তাঁর চার মেয়ের ছবি। আর ফায়ারপ্লেসের বাঁদিকের দেয়ালের ছবিতে আপনারা টমাস এবং মেরি ব্রিগসকে তাঁদের নয়জন সন্তানের সাথে দেখতে পাবেন।

ব্রিগস পরিবার যখন প্রথম এ বাড়িতে থাকতে আসেন, তখন এর দেয়ালে পলেস্তারার প্রলেপ ছিল। ১৮৮৭ সালে মেরি ব্রিগস বাড়িটি সংস্কার করার আগে এখানে কোন ওয়ালপেপার ছিলনা। এই ওয়ালপেপারটি কিন্তু সেই ১৮৮৭ সালের মূল ওয়ালপেপার। এই ঘরের বেশিরভাগ আসবাবপত্রই আর্ভিং এবং ব্রিগস পরিবারের মূল আসবাবপত্র; এমনকি ঘরের গালিচাটিও সেই ১৮৮৭ সালের।

আর্টেফ্যাক্ট প্রসঙ্গে কিছু কথা

জন ফ্রাঙ্কলিনের প্রতিকৃতি - এই প্রতিকৃতিতে উত্তর মেরুর সেই বিখ্যাত অনুসন্ধানকারী অভিযাত্রী জন ফ্রাঙ্কলিনকে দেখা যাচ্ছে। ১৯৪৫ সালে তাঁর জাহাজটি ইংল্যান্ড ছেড়ে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অন্তর্ধান ঘটে। ফ্রাঙ্কলিন উত্তরপশ্চিম সমুদ্রপথের মানচিত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন। এই প্রতিকৃতিটি এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কথিত আছে যে জন ফ্রাঙ্কলিনের বিধবা স্ত্রী জেন ফ্রাঙ্কলিন একবার নিউ ওয়েস্টমিন্স্টারে বেড়াতে এসেছিলেন আর তখন ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের নৌযানে চড়েও ছিলেন। জন ফ্রাঙ্কলিনের ভাগ্নী সোফি ক্র্যাকফ্টের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় জেন ফ্রাঙ্কলিন ভিক্টোরিয়া থেকে "মারিয়া" স্টীমারে করে যাত্রা করেছিলেন। সেই স্টিমার সংস্থার সভাপতি, মারিয়ার মালিক, খুব ভালো বাষ্পচালিত জাহাজের জন্য একজন দক্ষ নাবিক হিসাবে আর্ভিঙের নাম সুপারিশ করেছিলেন।

আর্টেফ্যাক্ট প্রসঙ্গে কিছু কথা

সোফা এবং তার সাথের মানানসই দুটি সবুজ চেয়ার বেগম এলিজাবেথ আর্ভিং তাঁর বাপের বাড়ি ডিক্সন পরিবার থেকে এনেছিলেন। কথিত আছে যে এগুলো মিসৌরি থেকে অরেগন ট্রেইল দিয়ে ওয়াগনে করে পোর্টল্যান্ডে আনা হয়েছিল ১৮৫০ অথবা ১৮৫২ সালে। সোফাটি অশ্বরোম দিয়ে ঠেসে ভরা, বসলে খোঁচা লাগে। সেটির সাথে মানানসই চেয়ারদুটির আচ্ছাদন নতুন করে লাগানো হয়েছে।

"আসবাবগুলো খাটো, কারণ রানী ভিক্টোরিয়ার উচ্চতা ছিল ৪ফুট ১০ইঞ্চি এবং তিনি নিজের জন্য মানানসই আসবাব পছন্দ করতেন। আর যেহেতু রানীর পছন্দই ছিল সেরা, তাই সবাই তাঁকেই অনুকরণ করতেন।" সবুজ চেয়ারদুটি ব্রিগস পরিবারের। লক্ষ্য করবেন, মহিলাদের চেয়ারে কোন হাতল নেই। সে সময়ে মহিলাদের লম্বা স্কার্ট এমনভাবে পড়া নিয়ম ছিল যেন বসলেও তাঁদের পায়ের গোড়ালি দেখা না যায়। তাই চেয়ার এমনভাবে বানানো হত যেন লম্বা স্কার্টে তা ঢেকে যায়।

চেয়ারের সামনেই মেঝেতে রাখা জলচৌকি, যেন পা ঠাণ্ডা মেঝেতে লেগে না যায়। সে সময় কোন অন্তরণ ছিলনা।

দেয়ালে টাঙানো কুটিরের চিত্রকর্মটি ক্যাপ্টেন উইলিয়াম আর্ভিঙের মেয়ে নেলির করা।

বড় বৈঠকঘর

ছোট বৈঠকঘরের ঠিক উল্টোদিকেই বড় বৈঠকঘর। এ ঘরে কম আনুষ্ঠানিক, যেমন পারিবারিক সভার মত কাজে সবাই জড়ো হতেন। মহিলারা এখানে বসে তাঁদের বৈকালিক চা-নাস্তা খেতেন, বাচ্চারা তাদের গানের চর্চা আর মেয়েরা এখানে বসেই নানারকম সেলাই-ফোঁড়াই শিখত। এ ঘরটিতেই প্রতি রবিবার বিকেলে পরিবারের সবাই জড়ো হতেন। বড়রা নৈশভোজনের পর অথবা গির্জা থেকে ফেরার পর এখানে বসেই নানা বিনোদনমূলক কাজ করতেন, যেমন পিয়ানো বাজানো।

যেমনটা আগেই বলেছি, এ ঘরের ওয়ালপেপার এবং গালিচা সেই ১৮৮৭ সালের পুরনো। এর আগে দেয়ালে কেবল প্লাস্টার ছিল। সিলিং ঘেঁষে যে কাছি দড়ির নকশা করা হয়েছে, তা করা হয়েছে ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের নৌপথে বানিজ্যের সময়কে স্মরণ করে।

কোন সন্দেহ নেই যে এ ঘরটিতেই ১৮৭২ সালে ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল। ম্যানুয়েলা আর নাওমি এ ঘরেই পিয়ানো বাজানো শেখাতেন।

ফায়ারপ্লেসের উপরে বিশাল সোনালী আয়নাটি টমাস এবং মেরির ১৮৭৪ সালের বিয়ের উপহার। কিন্তু ১৮৮৪ সালে মেরি তাঁর বিধবা মায়ের কাছ থেকে এ বাড়িটি কিনে নিয়ে এখানে থাকতে আসার আগে আয়নাটিও এখানে ছিলনা।

সোফায় রাখা পুতুলটি রবিবারীয় পুতুল। পুতুলটির মাথা চীনামাটির আর পুতুলটির কনুই আর কনুইয়ের নিচের বাহুর অংশও রয়েছে। পুতুলের নাম রবিবারীয় পুতুল হবার কারণ খুব সম্ভবত যে বাচ্চারা এই পুতুল নিয়ে কেবল রবিবারেই খেলতে পারত।

সম্মুখ হল/প্রধান প্রবেশপথ

এখানে ঘরের ভিতরের ছাদটির উচ্চতা ১২ ফুট আর সিঁড়িটি ২৩ ধাপসম্পন্ন (আজকের ৮ ফুট উঁচু ছাদটির রয়েছে ১৩টি ধাপ)। ঘরের ভিতরের ছাদে বৃহদাকার পদকাকৃত নকশাটি এ বাড়ির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নকশার বিশেষ কাঁটাগাছ ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের স্কটিশ ঐতিহ্যের প্রতীক আর গোলাপফুল পোর্টল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের সাথে তাঁর বধূর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

হলওয়ের গালিচা আর ওয়ালপেপার ১৯৫৩ সালে লাগানো হয় যখন আর্ভিং নিবাসকে জাদুঘরে পরিণত করা হয়।

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে এ বাড়ির প্রবেশদ্বার এবং উপরতলার ওয়াল পেপার শেষ ভিক্টোরীয় যুগের আদলে পুনরায়ণ করা হয় যা বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের পর থেকে আর দেখা যায় নি। ২০০৯ সালে সংরক্ষক সাইমন ভোগেল-হরিজের সাথে কাজ করবার সময়ে জাদুঘর কর্মীরা আনুমাণিক ১৮৯৭-১৯০৩ সালের এই ওয়াল পেপার আবিষ্কার করেন। তিন টুকরোর এক সেটে ছিল এই ওয়াল পেপার, ১৮" পুরু ছাদের কারুকার্য আর একটি সিলিং পেপার। ২০১৮ সালে, হেরিটেজ কনসাল্টেন্ট ও দেয়াল কাগজ নকশাকার স্টুয়ার্ট স্টার্ক এই দারুণ দেয়াল কাগজগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনর্ক্কণ করেন এই বাড়ির জন্যই ব্যবহৃত আদি প্যালেটে। তারপর এগুলো বিলাত থেকে ছাপিয়ে নিউ ওয়েস্টমিনস্টারে স্থাপনের জন্য পাঠানো হয়। এমনকি হলওয়ের কার্নিশ আর প্রবেশদ্বারের ছাদের বৃহদাকার পদকটিও ওয়াল পেপারের অনুপূরক হিসাবে আদি রঙের সাথে মিল রেখে নতুন করে রং করা হয়।

➢ এদিক দিয়ে উপরতলায় উঠুন

শিশুঘর

এই ঘরটি খুব সম্ভবত শিশুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত। বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে ঘরটি সাধারণ শোবার ঘরেই পরিণত হওয়ার কথা। ব্রিগস পরিবার এ বাড়িতে অবস্থানকালীন একজন আবাসিক আয়া রেখেছিলেন। খুব সম্ভব, তাঁদের আয়া এ ঘরেই ঘুমাতেন।

আর্টেফ্যাক্ট প্রসঙ্গে

হাল্কারঙের আসবাবগুলো ব্রিগস পরিবারের। অদ্ভুত আকৃতির কেতলিটি আসলে একটি পেয়ালা যা কেউ অসুস্থ শরীরে ব্যবহার করতে পারতেন। পেয়ালার হাতলটি যে পাশে, তাতে অসুস্থ ব্যক্তি শোয়া অবস্থা থেকে না উঠেই পেয়ালার নলের মাধ্যমে ওষুধ সেবন করতে পারতেন।

বিছানার পাশের দেয়ালের ছবিটি রানী ভিক্টোরিয়ার যখন তিনি চার বছরের রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ছিলেন। এ ছবিটি লন্ডনের ডালউইচ গ্যালারির একটি চিত্রকর্ম অবলম্বনে আঁকা।

কাপড়ের আলমারির উপর রাখা নীল বোতলটি আসলে একটি নৈশবাতি। বোতলের ভেতরে একটি মোমবাতি আছে। মোমবাতি পুরোপুরি গলে যাওয়ার আগেই ঘুম এসে পড়ার কথা।

বিছানার পায়ের কাছে চেয়ারে বসা পুতুলটি ১৮৯৮ সালের অগ্নিকান্ড থেকে বেঁচে যায়। পুতুলটি লেক্সী ইউয়েনের। ১৮৯৮ সালের বিশাল অগ্নিকান্ডের আগে তাঁর পারিবারিক বাড়িতে চেয়ারে রাখা এই পুতুলটির একটি ছবি আছে।

<u>প্রধান শয়নকক্ষ</u>

বেলকনির দিকে যাবার পথে ডান পাশেই রয়েছে প্রধান শয়নকক্ষ। ক্যাপ্টেন এবং বেগম আর্ভিং এ ঘরেই থাকতেন। এ ঘরের কয়েকটি মূল পারিবারিক আসবাবের মধ্যে রয়েছে এই খাট, এই দুটি চেয়ার আর মর্মর পাথরের শিরোভাগবিশিষ্ট এই কাপড়ের আলমারি। যেহেতু এই বাড়িটি প্রবাহমান পানি সরবরাহের আগে নির্মিত হয়েছিল, তাই লক্ষ্য করবেন যে এ ঘরে কয়েকটি পানির জগ আর হাতমুখ ধোবার গামলা রয়েছে। ঘরে আরো রয়েছে একটি মূত্রদানি যা কেবল রাতের বেলাতেই ব্যবহার করা হত যখন কিনা প্রচন্ড ঠাণ্ডায় আর অন্ধকারে বাড়ির বাইরে যাওয়া যেতনা। আরো লক্ষ্য করবেন যে এই ঘরের ভিতরের দরজা দিয়েই ঠিক পাশের শিশুকক্ষে যাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে ঘরের ভিতরের এই দরজাটি বাড়ি নির্মাণের পরে সংযোজন করা হয়। তার একটা কারণ হলো এ ঘরের দেউড়ির কাঠামো আর পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠের কাঠামো এক নয়। ঢালাই লোহার ছোট্ট চুল্লীটি এ ঘরের মূল আসবাবের একটি যা শীতকালে ঘরটিকে উষ্ণ রাখত। খুব সম্ভব প্রত্যেকটি শোবার ঘরেই একটি করে এমন চুল্লী থাকত।

ভিক্টোরিয়ান আমলের বাড়িতে দেয়াল প্রকোষ্ঠ সাধারণত থাকত না তার কারণ এগুলো নির্মাণে অনেক জায়গাও লাগত, আর অনেক খরচও পড়ত। কিন্তু এই বাড়ির প্রায় প্রতিটি ঘরেই দেয়াল প্রকোষ্ট রয়েছে যা আর্ভিং পরিবারের ধন-সম্পদের সাক্ষ্য বহন করে।

<u>মেয়েদের শয়নকক্ষ</u>

প্রধান শয়নকক্ষের ঠিক উল্টো দিকেই মেয়েদের শোবার ঘর। ভিক্টোরিয়ান আমলে সাধারণত বাচ্চাদের নিজস্ব শোবার ঘর থাকত না। অনিবার্যভাবেই তাই বাড়ির একটি শোবার ঘরে সব ছেলেরা একসাথে আর আরেকটি শোবার ঘরে সব মেয়েরা এককসাথে থাকত। এই ঘরটিতে চার আর্ভিং কন্যা, মেরি, সুজান, এলিজাবেথ আর নেলি একসাথে বড় হয়েছেন। এই ঘরটিকে ঐ সময়ের তরুণী মেয়েদের শোবার ঘরের আদলে সাজানো হয়েছে। লক্ষ্য করবেন যে, কামরার বাঁ দিকে দুটি বৃহদাকার প্রদর্শাধার রয়েছে। এগুলো এক সময়ে

দেয়াল প্রকোষ্ঠ ছিল। একটি প্রকোষ্ঠের দরজা এই ঘরের ভিতর দিকে খুলত আর আরেকটির খুলত পাশের ঘরের দিকে। এ বাড়িটি পৌরমালিকানাধীন হবার পর প্রকোষ্ঠদুটিকে প্রদর্শাধারে পরিণত করা হয়।

বাঁ দিকের প্রদর্শাধারের বাঁ পাশে একটি পশমী পোশাক ঝুলতে দেখছেন। এ পোশাকটি মেরি আর্ভিঙের (বিয়ের পর ব্রিগস) আর এই পোশাকের পেছনে, ডানদিকে এই পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাঁর ছবি ঝুলছে। হাতের ডানদিকে ঝুলছে সর্বকনিষ্ঠ আর্ভিং কন্যা নেলির বিয়ের পোশাক। এই প্রদর্শাধারে আরো অনেক ব্যবহার্য জিনিসপত্র রয়েছে যা সে আমলের একজন নারী প্রতিদিন পরতেন বা ব্যবহার করতেন। প্রদর্শাধারের নিচে রাখা আছে হরেক রকমের চিরুনী আর চুলের কাঁটা। একজন ভিক্টোরিয়ান নারীর জন্য তার কেশসজ্জার সরঞ্জামাদি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কেশই ছিল তাঁর নিখুঁত সৌন্দর্যের গৌরব। নারীরা লম্বা চুল রাখতেন আর কোন প্রসাধন ব্যবহার করতেন না কারণ সে আমলের অভিমত অনুযায়ী নারীর সৌন্দর্য হওয়া উচিত প্রকৃতিদত্ত যা কিনা কোন কৃত্রিম শোভাবর্ধণের মুখাপেক্ষী নয়।

ডানদিকের প্রদর্শাধারে একটি ভ্রমণের ট্রাঙ্কের উপর বিছানো রয়েছে একটি নীল পোশাক। এ পোশাকটি বেগম আর্ভিঙের তরুণ বয়সের। বেগম আর্ভিং ইন্ডিয়ানায় জন্মেছিলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবার অরেগন রেলগাড়ির বিপদসঙ্কুল যাত্রা পাড়ি দিয়ে অরেগনের পোর্টল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন। এই পোশাকেই বেগম আর্ভিং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। এই প্রদর্শাধারেই আরো রয়েছে পারিবারিক কিছু ছবি আর বিবিধ নৌচালন যন্ত্রপাতি – যেমনটি ক্যাপ্টেন আর্ভিং তাঁর জাহাজে ব্যবহার করতেন। এই প্রদর্শাধরের ভিতর চেয়ারে বসা লালচুল মাথার যে চীনামাটির পুতুলটি রয়েছে তা এক আর্ভিং নাত্নীর, যার নাম ছিল মেরি আইলীন কক্স। এই পুতুলের মাথার চুল কিন্তু মেরি আইলীনের নিজের চুল! ধারণা করা হয় ক্যাপ্টেন আর্ভিঙের মাথার চুলও ঠিক এই বর্ণের ছিল। প্রদর্শাধারের নীচের দিকের ডানকোণায় দেখা যাচ্ছে মেরি আইলীনের একটি ছবি। (লক্ষ্য করুন তার চুল কত লম্বা!)

এই ঘরের আরেকটি লক্ষ্যণীয় বস্তু, কাপড়ের আলমারির ওপরে রাখা গোলাপি রঙের গোলকাকৃতির কেশদানী। ভিক্টোরিয়ান আমলের নারীরা কখনো চুল আঁচড়ানোর সময়ে ঝরে পড়া চুল ফেলে দিতেন না। বরং এমন কেশদানীতে সংগ্রহ করে রাখতেন। এই ঝরে পড়া চুল দিয়ে ভিক্টোরিয়ানরা তৈরি করতেন অলংকার অথবা চুলের মালা। এমনি এক চুলের মালা আপনি এ ঘর থেকে প্রস্থানের সময়ে দরজার ডানদিকে ঝুলতে দেখবেন। এমন একটি চুলের মালায় রয়েছে পরিবারের কয়েক সদস্যের মাথার চুল। পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে যাঁরা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদের নিজেদের মাঝে রেখে দেবার এক পন্থা এটি। আলোকচিত্র তখন অনেক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই এমন একটি চুলের মালাই ছিল প্রায়শ ক্ষেত্রে কোন পারিবারিক সদস্যের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

জনের ঘর

যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, সব ভাইয়েরা বা সব বোনেরা শোবার ঘরে একসাথেই থাকত। জন ভাগ্যবান; যেহেতু জন ছিল আর্ভিং পরিবারের একমাত্র ছেলে, তাঁর একার নিজস্ব শোবার ঘর ছিল। এই ঘরটিকেও সাজানো হয়েছে সেই আমলের একজন কিশোরের ঘরের মতই। একদম ঐ কোণের দেয়ালে আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন তা আজকের পোশাকভাণ্ডার। দেয়াল প্রকোষ্ঠের বদলে এমন পোশাকভাণ্ডারেই একজন ভিক্টোরিয়ান তাঁর জামা-কাপড় আর আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র রাখতেন। সাজ-সজ্জার আলমারির উপর আপনি এমনি কিছু পরিধেয় জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন যা ঐ সময়ের একজন তরুণ ব্যবহার করতেন। যেমন, উঁচু রেশমী টুপি, খুলে রাখা যায় এমন আস্তিন-বোতাম, গলাবন্ধ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ভিক্টোরিয়ান যুগে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত কিন্তু তাঁরা আজকের দিনের মত তাঁদের পোশাক এত ঘন ঘন ধুতেন না। তার বদলে, কাপড়ের যে অংশটুকু বেশি নোংড়া হত, তাঁরা শুধু অতটুকু অংশই নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, যার মধ্যে রয়েছে আস্তিন আর গলাবন্ধ। এজন্য তখনকার দিনে শার্টের অংশগুলো সেলুলয়েড (পাস্টিকের এক আদি রূপ) দিয়ে বানানো হত।

গোলাগুলির গল্প

জনের ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির পেছন দিকে যাবার পথে আপনি দরজার কাঠামোর পাশ দিয়ে যাবেন। এই কাঠামোর বাম দিকের মাঝামাঝি আপনি একটা ছোট্ট গর্ত দেখবেন। যদি গর্তটির ভিতরে তাকান, তাহলে একটা ছোট্ট ধাতব বস্তু দেখবেন। এটি ১৮৯৬ সালের একটি গুলি। কথিত আছে যে এক শীতের রাতে দুই ব্যক্তি ব্রিগস পরিবারের এই বাড়িতে অনুপ্রবেশ করেছিল। গভীর রাতে ব্রিগস পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তানদের একজন, বেরিল, ঘুম থেকে জেগে এই দরজার পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে পানি পান করার জন্য হলওয়ের ঐ পাশে যাচ্ছিলেন যেখানে পানি রাখা ছিল। সিঁড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে এক অপরিচিত লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বাবা আর ভাইদের ঘুম থেকে ডেকে তোলেন, আর কিছু সময়ের ব্যবধানেই বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বিছানা ছেড়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। টমাস ব্রিগস সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে আতংকিত হয়ে অনুপ্রবেশকারীদের একজন সিঁড়ির ওপরের দিকে পরিবারটিকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে।[7] জানা যায়নি যে সে কি আসলেই পরিবারটির কারো কোন ক্ষতি করতে চেয়েছিল নাকি শুধু তাঁদের ভয় দেখতে চেয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে গুলিটি পরিবারের কারো গায়ে লাগেনি; এই দরজার কাঠামোর ভিতরে গুলি ঢুকে যায়। ব্রিগস পরিবার পরে আর কখনো এই নষ্ট জায়গাটা মেরামত করেননি আর গুলিটি আজ পর্যন্ত এই দরজার কাঠামোর ভিতরেই রয়ে গেছে।

ঐ অনুপ্রবেশকারী দুজন মাত্র ৮০ ডলারের সমমূল্যের টুকিটাকি মনোহারি জিনিসপত্র নিয়েই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যে জিনিসগুলো তস্কররা সরাতে চেয়েছিলো, সেগুলো তারা বাড়ির প্রবেশদ্বারের মেঝেতে জমা

[7] আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা

করছিলো। এই ঘটনা নিয়ে লেখা এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে তদন্তে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন তস্করের দল পার্লারের জানালা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে সক্ষম হয়। ঘটনার পরদিন সকালে পুলিশ বাড়ির বাইরে স্ক্রু ড্রাইভার, অগ্নি উৎপাদক কল এবং লণ্ঠনের ভিতর থেকে খুলে নেয়া তেলদানী খুঁজে পায়। এই ঘটনা নিয়ে লেখা প্রতিবেদনগুলো আর্ভিং নিবাসের অনুপ্রবেশের সাথে পূর্বের সপ্তাহে রয়েল এভেন্যুতে ঘটে যাওয়া তিনটি অনুপ্রবেশ প্রচেষ্টা এবং ভ্যাঙ্কুভারের আশপাশের অনুপ্রবেশের ঘটনাগুলোর সাদৃশ্য তুলে ধরে। এর মাধ্যমে পরিবার পরিজনদের বিপজ্জনক অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এলাকাবাসীদের সতর্ক করা হয়।

১৮৯৬ সালের ৩রা ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে পরবর্তী পুলিশি তদন্তের সাফল্য তুলে ধরা হয়। এই প্রতিবেদনমতে, ব্রিগস পরিবারের চুরি যাওয়া মালামালের কিছু অংশ একটি খালি বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। কনস্টেবল ডোমিনি এবং মিলারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ভোর ছ'টার দিকে এই খালি বাড়িতে অবস্থান নেয় যখন এক ব্যক্তি এ বাড়িতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়। দূর্ভগ্যবশত, সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিকে বাড়িতে ঢুকার আগেই গ্রেফতারের প্রচেষ্টা সময়ে কনস্টেবল ডোমিনি "স্পষ্টতই তাঁর মস্তিষ্ক খোয়ান"[৪]। সন্দেহভাজন কনস্টেবল ডোমিনির দিকে তাক করে গুলি ছোড়ে। গুলিটি তাঁর এত কাছ দিয়ে যায় যে তাঁর মাথায় জ্বলন্ত বারুদের গুঁড়ো লেগে যায়। সেই সন্দেহভাজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে আরো নয়টি গুলি ছোড়ে। গুলিগুলো ০.৪৪ ক্যালিবার থেকে ছোড়া - এই একই গুলি তিনরাত আগে টমাস ব্রিগসের বাসায় ছোড়া হয়[৯]।

<u>বাড়ির পেছনদিক</u>

দেউড়ি দিয়ে যাবার সাথে সাথেই আপনি লক্ষ্য করবেন যে বাড়ির এ অংশটি বাকি অংশের মত ভালোভাবে নির্মিত হয়নি। খুব সম্ভব, আর্ভিংরা যখন এ বাড়ি নির্মাণ করেন, তখন বাড়ির এ অংশটি তাঁরা প্রধানত গুদামঘর হিসাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ব্রিগস পরিবার এ বাড়িতে উঠে আসার পর তাঁরা বাড়ির এ অংশটি আরো ব্যবহারিক কাজের জন্য খুলে দেন। ডানদিকের ঘরটি শোবার ঘর হিসাবে পুনর্গঠণ করা হয়েছে।

হলঘরের উল্টোপাশে বাঁদিকে শণের দেয়াল প্রকোষ্ঠটি সম্পূর্ণই সিডার কাঠের তৈরী। যেকোন ধরণের শণের দেয়াল প্রকোষ্ঠের নির্মাণসামগ্রী হিসাবে সিডারই পছন্দনীয় কারণ এটি ভাঁড়ার ঘরের পোকামাকড় তাড়াতে এক প্রাকৃতিক বিতাড়ক। বাঁদিকে আপনি আক্ষরিক অর্থেই একটি গোসলখানাও দেখতে পাবেন যা ঠিক পাশেই শৌচাগার থেকে পৃথক করা। এ জায়গাটি ১৯০৬ সালেই হয়ত গোসলখানায় পরিণত করা হয় যখন এ

[৪] আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা
[৯] আর্ভিংদের সামাজিক পঞ্জিকা

বাড়িতে শেষমেশ পানির সংযোগ স্থাপিত হয়। বাকি যে অংশটিতে আজ আমরা বাচ্চাদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি, হয়ত ব্রিগস পরিবারের জন্য এক সময়ে কর্মস্থান ছিল।

আপনি হয়ত এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে এ অংশে নিচ তলায় যাবার জন্য একটি বাড়তি সিঁড়ি আছে। এটি পরিচারকদের সিঁড়ি। এ বাড়িতে বাবুর্চিসহ তিনজন চৈনিক পরিচারক কাজ করতেন। বাড়ির অন্য সদস্যদের যেন গৃহস্থালির কাজকর্মের শব্দে বিরক্ত করা না হয়, তা নিশ্চিত করতেই বাড়ির কাজের লোকেরা বাড়ির পেছনের এই সিঁড়িটি ব্যবহার করতেন। এই সিঁড়িটি দিয়ে নামার সময়ে আপনি খেয়াল করবেন যে এই সিঁড়িটি অবিশ্বাস্যরকমের মজবুত। ভিক্টোরিয়ান আমলে সাধারণত এত সময় বা অর্থ ব্যয় করে দ্বিতীয় একটি সিঁড়ি বা পরিচারকদের ব্যবহারের জন্য কোন সিঁড়ি এত ভালোভাবে নির্মাণ করার কথা নয়, কারণ যাঁরা এমন সিঁড়ি ব্যবহার করতেন তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যাথা ছিলনা। কিন্তু এই সিঁড়িটি যখন এত ভালোভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, তখন ধারণা করা যেতেই পারে যে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতেন।

<u>রান্নাঘর</u>

সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেছনের দরজা পার হয়ে আপনার বাঁদিকে প্রথম যে দরজাটি পড়বে, তা রান্নাঘরের। এখানে আপনি পাবেন ভিক্টোরিয়ান আমলের লোহার আর কয়লার চুল্লী। এই চুল্লীটি কিন্তু ১৯১৫ সালের পুরোনো আর ব্রিগস পরিবারের ব্যবহার করা চুল্লী। চুল্লীর সম্মুখভাগে আছে একটি তাপমাণযন্ত্র যদিও ঐ আমলে মহিলারা ঠিকই তাপের আঁচ থেকে তাপমাত্রার আন্দাজ করতে পারতেন। এই চুল্লীটি হয়ত শুধু রান্নার কাজেই নয়, বরং শীতের দিনগুলোতে বাড়িটি উষ্ণ রাখতেও ব্যবহৃত হত। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম পড়লে বাড়ির সব রান্না-বান্না বাড়ির পেছনের বারান্দায় বা বেইজমেন্টে স্থাপিত গ্রীষ্মকালীন রান্নাঘরে করা হত[10]। রান্নাঘর জুড়ে আপনি নানান রকম ব্যবহার্য জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন, যেমন টেবিলের উপর রাখা মাখন তোলার মন্থনযন্ত্র, ডিম ফেটানোর যন্ত্র। পেছনের কাউন্টারে আরো রাখা আছে পাউরুটি বানানোর আদি যন্ত্র (বাঁকানো হাতলওয়ালা, দেখতে অনেকটা ধাতব বালতির মত), আর একটি যান্ত্রিক ছুরি পরিষ্কারক। পাশের বাঁকানো হাতল দিয়ে পরিষ্কারকটি চালানো যায়। ছুরির ধারালো অংশ পরিষ্কারকযন্ত্রের ওপর দিয়ে ঢুকানো যায় আর বাঁকানো হাতলটি ঘুরালে ভিতরের মার্জনী ঘুরতে থাকে। ভিতরের মার্জনীতে সিরিশগুঁড়ো লাগানো আছে যা ছুরির ধারালো অংশকে চকচকে পালিশ দেয়। একে বলা হত পরিচারকের ভৃত্য।

<u>ভোজনশালা</u>

রান্নাঘর সংলগ্ন দরজা দিয়ে গেলেই খাবার ঘর। ভিক্টোরিয়ান গৃহশৈলী অনুসারে এই কক্ষের নিম্নাংশের কাঠের বার্নিশ কালচে রঙের হয়ে থাকবে যাতে ঘরটিকে একটু ছোট মনে হয়। এখনকার নীলবর্ণ জাদুঘর আমলের।

[10] প্রাক্তন প্রদর্শক জিন ডরগান বেজমেন্টে গ্রীষ্মকালে রান্না করার জন্য একটা চুল্লী সরানোর কথা বলেছিলেন।

কলাম্বিয়ান খবরের কাগজে এই ভোজনশালায় অনুষ্ঠিত অনেক বড় বড় ভোজের গল্প খুঁজে পাবেন। মেরি ব্রিগস এখানে প্রচুর আতিথেয়তার আয়োজন করে থাকতেন। বিশেষত তাঁর প্রিয় দাতব্যর স্বার্থে তিনি এখানেই অনেক রাতের ভোজ আর চা-পর্বের আয়োজন করেছেন।

দিনের প্রধান আহার সাধারণত দুপুরে করা হত। ব্যবসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখা হত যেন সকলেই বাড়ি যেয়ে দুপুরের আহার সারতে পারেন। ভিক্টোরিয়ানরা বেশ ভালো রকমই খাওয়া-দাওয়া করতেন। খাবার পরিবেশনের সময়ে বাড়ির কর্তা টেবিলের মাথায় একটি আর্মচেয়ারে বসে সবার জন্য গোশত টুকরো করে দিতেন। বাড়ির গিন্নী টেবিলের বিপরীত মাথায় বসে সকলের পাতে সবজি বেড়ে দেওয়ার দায়িত্বে থাকতেন। পরিবারের সাথে কোন সম্মানিত মেহমান থাকলে তিনি মেজবানের ডানে বসতেন এবং তাঁকেই সবার আগে খাবার পরিবেশন করা হত। পালাক্রমে সকলের পাতে খাবার পরিবেশন করা হত। এভাবে পরিবেশন শেষে, সকলে মিলে খাবার সময়কার দোয়া পড়ে খাওয়া শুরু করতেন। খাওয়া শেষে মহিলারা সাধারণত বড় বৈঠকঘরে চলে যেতেন আর পুরুষেরা মদ্যপান, ফলমূল আর বাদাম খেতে খেতে বাণিজ্যিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।

এই কক্ষে আপনি একটি দেয়াল প্রকোষ্ঠ লক্ষ্য করবেন যা খানসামার ভাঁড়ারঘর হিসাবে পরিচিত। এ ঘরটি এখন যে বৈদ্যুতিক প্রকোষ্ঠ আছে, তার সাথে প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত ছিল। এ ঘরটি খুব সম্ভবত পরিচারকের অধিগমন স্থান ছিল যারা রান্নাঘর থেকে সব কিছু পরিবেশনের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তবে এ বাড়িতে কখনো কোন খানসামা থাকার প্রমাণ মেলেনি।

<u>গ্রন্থাগার</u>

ভোজনশালা থেকে বেরিয়ে নিচতলার প্রধান হলওয়েতে গেলে আপনার ডানদিকে প্রথম যে ঘরটি পড়বে, সেটি পাঠাগার। ধারণা করা হয় যে এ ঘরটি একধরণের দফতর হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং পুরুষকক্ষ বলেই পরিচিত ছিল, যার অর্থ দাঁড়ায় যে মহিলাদের একমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ ছাড়া এ ঘরে ঢোকা বারণ ছিল।

বিশাল ধনুকাকৃতির খিলানটি ১৯০০ দশকের প্রথম দিকের এক পুনঃসংস্কার বলে ধারণা করা হয়। তার আগে এখানটায় খুব সাধারণ একটি দরজাই হয়ত ছিল। এ ঘরের পর্দা খসড়া পর্দা বলে পরিচিত যা জাদুঘরের কর্মচারিরা ১৯৯০ দশকের দিকে সংস্থাপন করেন। আমরা এখন পর্যন্ত জানিনা যে ব্রিগস পরিবার এমন কোন পর্দা লাগিয়েছিলেন কিনা। এমন একটি পর্দা চুল্লী থেকে আশা গরম ধূপ থেকে ঘরটিকে সুরক্ষা দিতে পারত।

এই ঘরে আপনি আদিবাসীদের তৈরী বেশ কয়েকটি ঝুড়ি দেখতে পাবেন। এমন ঝুড়ি আদিবাসী মহিলারা তৈরি করতেন এবং দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাঁরা এই ঝুড়ি বিক্রি করে থাকবেন। এ ঝুড়িগুলো সাধারণত ব্যবহৃত কাপড় অথবা এমনকি চা, কফি বা চিনির বিনিময়ে লেনদেন করা হত। মেরি ব্রিগস এই ঝুড়িগুলো খুব

পছন্দ করতেন; তাঁর এমন অনেক ঝুড়ি ছিল। তিনি এমন ঝুড়ি তাজা ফুলে ভর্তি করে সারা বাড়িতে সাজিয়ে রাখতেন। ১৯১২ সালে বেরিল আর ওয়াল্টারের বিয়ের সংবর্ধনায় বিয়ের উপহারগুলো প্রদর্শন করতেও এ ঝুড়িগুলো কাজে লাগিয়েছিলেন।" বড় বৈঠকঘরে অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার সাজানো ছিল, তার মাঝে ছিল গোলাপের তোড়ার বাটি, আর পাঠাগার আর হলপথে একই জিনিস আদিবাসীদের তৈরিকৃত ঝুড়িতে শোভা পাচ্ছিল।"[11] দুঃখজনক যে আমাদের কাছে মেরির সংগৃহিত ঝুড়িগুলো নেই কিন্তু সেগুলোর একটা ছবি আমাদের কাছে আছে। ওকামুরা নাম্মী এক জাপানী চিত্রগ্রাহক এ ছবিটি তুলেছিলেন। ছবিটির একটি কপি পাঠাগারের মুখোমুখি ঠিক আপনার পেছনের দেয়ালে ঝুলছে।

পাঠাগারের পেছন দিকে ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী শিল্পী লুকা মাদ্রাসির ১৮৮৭ সালের (প্রথম দুঃখ)ভাস্কর্যের একটি প্রতিরূপ রয়েছে যার ভিতরে একটি বাতি লাগানো আছে। ধারণা করা হয় যে ব্রিগস পরিবার এটি ১৯১৪ সালে এ বাড়িতে আনেন যখন বাড়িতে প্রথম বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয়।

মাতামহীর কক্ষ

সর্বশেষ যে ঘরটি আমরা পরিদর্শন করবো তা মাতামহীর কক্ষ বলে পরিচিত আর পাঠাগারের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে বিধবা এলিজাবেথ আর্ভিং তাঁর মেয়ে মেরি ব্রিগসের কাছে এ বাড়িটি বিক্রি করে পোর্টল্যান্ডে ফিরে যান ঠিকই, কিন্তু যখন তিনি মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসতেন, তখন এই ঘরেই থাকতেন। তিনি বেশ নিয়মিতই এখানে বেড়িয়ে যেতেন, আর এই ঘরটাই একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলার থাকার জন্য সুবিধাজনক ছিল যাতে তাঁকে সিঁড়ি বেয়ে ওপর-নিচ ওঠানামা করতে না হয়। তাছাড়া, নয়জন বাচ্চা-কাচ্চা ভর্তি এই বাড়িতে এই ঘরটিই তাঁর জন্য বেশ নিরুপদ্রব ছিল।

এ ঘরটিকে 'প্রভাতঘর' বা 'নাস্তা-ঘর'ও বলেও অভিহিত করা হয় কারণ পরিবারটি কখনো কখনো এই ঘরে বসেই হালকা নাস্তা সারতেন। এই ঘরে চা খেতে খেতে দাওয়াত আয়োজনের পরিকল্পনাও চলত। বর্তমানে, এ ঘরটিকে 'প্রভাতঘর' রূপেই সাজানো হয়েছে আর যখন কোন অতিথি থাকতেন না তখন বাড়ির গিন্নী দিনের বেশির ভাগ সময় এঘরেই কাটাতেন। বাচ্চাদেরও এ ঘরে ঢোকার অনুমতি ছিল; এ ঘরটিকে আজকের পারিবারিক বৈঠক ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

বর্তমানে জাদুঘর এ ঘরটিতে বড়দিন আর মা-দিবসের চা-পর্ব আয়োজন করে থাকে যখন অভ্যাগতরা এসে ভিক্টোরিয়ান ঢঙে চা-নাস্তা করে থাকেন।

আর এরই মধ্য দিয়ে আমাদের পরিদর্শনও শেষ হলো। অনুগ্রহ করে, পাঠাগারের উল্টোদিকে টেবিলের উপর রাখা আমাদের অতিথি-বইয়ে সই করুন। এখানে জাদুঘরের জন্য চাঁদা দান করার ব্যবস্থাও রাখা আছে।

আর্ভিং নিবাস পরিদর্শনের জন্য ধন্যবাদ। আশা করি এখানে কাটানো সময় উপভোগ করেছেন।

---

[11] দ্য ব্রিটিশ কলাম্বিয়ান, শনিবার, জুন ২৯, ১৯১২, পৃষ্ঠা ৯